দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত দৈনিক বুলেটিন

বায়োস্কোপের বাক্স

শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

KICFF 2026

সংখ্যা ৩
২৫ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

উৎসবে ফেলুদার ফিল্মের তোড়া। রহস্য কাহিনির সঙ্গেই ঘোরা।

ফেলুদাগিরি

সম্রাট মুখোপাধ্যায়

ফেলুদা পৌঁছে গেল ষাটে! ১৯৬৫ সালের শীতে ডিসেম্বর সংখ্যায় এসেছিল ফেলুদা প্রথম ‘সন্দেশ’ পত্রিকার পাতায়! ‘ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি’।তারপর ‘বালাই ষাট’ করতে করতে ষাটটা বছর পার!

স্রষ্টার নাম যখন সত্যজিৎ রায়, এমন চরিত্র শুধু বইয়ের পাতায় আটকে থাকার নয়।কলমে লিখেছেন প্রায় তিন ডজন কাহিনি।তার থেকে বড়ো পর্দায় দুটো, ছোটো পর্দায় একটা ছবি বানিয়ে স্রষ্টা চলে গেছেন সাড়ে তিন দশক আগে। ফেলুদার কাহিনি থেমে গেছে। তবে ফেলুদার পর্দায় আসা কিন্তু থামেনি সন্দীপ রায়ের জন্য। বানিয়ে গিয়েছেন একের পর এক ছবি।বড়ো আর ছোটো পর্দায়।রায়-দ্য-জুনিয়র বানিয়েছেন ১৯টি ছবি।তাতে গল্প ধরলে ২০টা।

‘ডবল ফেলুদা’য় ছিল দুটো গল্প।এই পুরো গুচ্ছের মধ্য থেকে বেছে মোট ১৫টি ছবির চমৎকার প্যাকেজ দেখানো হচ্ছে এবারের শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসবে।তার সঙ্গেই আছে সত্যজিতের বানানো দুটি ছবিও।

সন্দীপ রায়ের টিভি-র জন্য বানানো ছবিগুলোতে অধিকাংশই ‘চেম্বার ড্রামা’।মানে ঘরের মধ্যে গল্প।আর বড়ো পর্দার ছবিগুলো ‘ট্রাভেলোগ’। বেরিয়ে পড়ার মেজাজ। সেই ধরতাইটা সন্দীপ ধরে নিয়েছিলেন প্রথমেই ২০০৩-এ নিজের বড়ো পর্দার প্রথম ফেলুদা ছবি ‘বোম্বাইয়ের বোম্বেটে’ থেকেই। পরের ছবি ‘কৈলাসে কেলেঙ্কারি’তে সেই কাহিনি পাড়ি জমিয়েছিল ইলোরার গুহায়। আর তারপরে ‘টিনটোরেটোর যীশু’ গল্পে তো একেবারে বিদেশে পাড়ি।মাঝে একবার হিন্দিতে আর একবার বাংলাতে বানানো ‘যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে’-ও তো কাঠমান্ডু বিদেশের পটভূমিই। আর লখনউয়ের ঐতিহাসিক পটভূমিতে লেখা ‘বাদশাহী আংটি’ আর দক্ষিণ ভারতের প্রেক্ষাপটে লেখা ‘নয়ন রহস্য’ও দেখা যাবে এবারের ফেলুদা-ছবির গুচ্ছে। মানে রাজস্থান, বেনারস, লখনউ থেকে মুম্বই, চেন্নাই। আর কাঠমান্ডু আর হংকং পুরো একটা আনন্দ-ভ্রমণের স্বাদ এই উৎসবের দিনগুলিতে ফেলুদার সঙ্গে।

সত্যজিতের রীতিকে মান্যতা দিয়েই এসব ছবি কিন্তু গোয়েন্দা সিনেমার চালু ছকের ‘হু ডান ইট’ বা ‘অপরাধী কে’ গোছের নয়।বরং গোড়ায় অপরাধীকে চিনিয়ে দিয়ে তার পেছনে তাড়া-করানো ফেলুদা-তোপসে-জটায়ুকে। যাকে বলে ‘চেজিং থ্রিলার’।

সত্যজিতের বানানো ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ও দেখানো হবে এবার।মানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সব্যসাচী চক্রবর্তী, আবির চট্টোপাধ্যায় আর ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত চারজন ফেলু মিত্তিরই পাশাপাশি।

এবারের উৎসবে দেখানো না হলেও, ফেলুদাপ্রেমীরা দেখতে ভোলে না কখনও সাগ্নিক চ্যাটার্জি পরিচালিত তথ্যচিত্র ‘ফেলুদা ফিফটি ইয়ারস অব রে’জ ডিটেকটিভ’। ২১, রজনী সেন রোডের সন্ধান থেকে জয়শলমিরের সোনার কেল্লা ফিরে দেখা।চিরতরুণ পাঠকদের মনে চিরযুবক ফেলুদার নানা সুলুকসন্ধান।এ যেন গোয়েন্দার ওপর গোয়েন্দাগিরি।

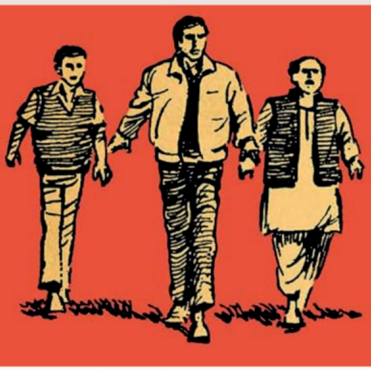

ফেলুদার ছবি: সন্দীপ রায়ের শুভেচ্ছাবার্তা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারই প্রযোজনা করেছিলেন ‘সোনার কেল্লা’, আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরই তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের শিশু কিশোর আকাদেমির উদ্যোগে আয়োজিত দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্‌বোধনে দেখানো হচ্ছে ‘সোনার কেল্লা’। সদ্য ফেলুদার গোয়েন্দা-কাহিনি রচনারও পূর্ণ হল ষাট বছর।আশ্চর্য যোগাযোগ!

এই উৎসবে একই সঙ্গে উপস্থিত লেখক ও পরিচালক সত্যজিৎ রায়। স্বয়ং স্রষ্টা, যিনি ‘সোনার কেল্লা’ লিখেছেন এবং ছবিও করেছেন। কমবয়সিদের কাছে, এমনকি আমাদের কাছেও এর থেকে আনন্দের আর কী হতে পারে!

তার সঙ্গে আমার তৈরি একগুচ্ছ ফেলুদার ছবি একসঙ্গে এখানে উপস্থিত।আজকের ছোটোরা শুধু ছোটো পর্দায় নয়, বড়ো পর্দায় এই ছবিগুলো একসঙ্গে দেখলে, তাদের ফেলুদাকে যেমন নতুন করে পাবে, তেমনই সিনেমা মাধ্যমটিকেও ভালোভাবে চিনতে শিখবে। সেটাও খুবই গুরুত্বপুর্ণ।

উৎসবে মাঠের সাজ

পুরো মাঠ জুড়ে রত্নভাণ্ডার আর জলদস্যুর জাহাজ

শুভদীপ দত্ত

12th
Kolkata
International
Children's
Film Festival

এবারের উৎসবে মাঠের মেজাজ কিন্তু দারুণ মজাদার। পুরো মাঠ এক্কেবারে সেজে উঠেছে রত্নগুহার ভাণ্ডারে। পুরো চত্বরে খুদেরা খুঁজে বেড়াচ্ছে গুপ্তধন! এখানে-ওখানে-সেখানে, মাঠের আনাচকানাচে ছড়িয়ে আছে একের পর এক বড়ো বড়ো ঘড়া।সেই ঘড়ার ভেতর থেকে উপচে পড়ছে কতরকম মোহর আর গয়নাগাটি।যেমন সুন্দর সেগুলি দেখতে, তেমনই সুন্দর সেগুলো একসঙ্গে দেখতে পাওয়ার আনন্দ।ওইসব ঘড়া আর রত্নপেটিকাগুলিও কী চমৎকার দেখতে! রত্নভাণ্ডার মানেই জলদস্যুর কাহিনি। তাই, রবীন্দ্রসদনের গায়ে বিরাট বড়ো এক জলদস্যুর নৌকো। সেদিকে তাকালে তো চক্ষু একেবারে চড়কগাছ! দেখতে পাবে, সেখানে নোঙর ফেলেছে ভাইকিংদের বিশাল এক জাহাজ।মনে হবে, ফ্রান্সিস আর তার দলবল চলেছে অজানার অভিযানে। সোনার ঘণ্টা, রুপোর থাম, মণিমাণিক্যের জাহাজ খুঁজতে হবে তো তাদের!

তার থেকে একটু এগোতে, রবীন্দ্রসদনের পিছনদিকে, এক মজার অক্টোপাস পাহারা দিচ্ছে এক প্রকাণ্ড রত্নভাণ্ডার।সে তার বিরাট বড়ো শুঁড় দিয়ে আগলে রেখেছে গুপ্তধন।কেউ তা ছুঁতে গেলেই সে বুঝি রে-রে করে তেড়ে আসবে! আর নন্দন-১-এ ঢোকার মুখে তো সে এক বি-রা-ট চমক! একেবারে মুখেই রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত আলিবাবার রত্নগুহা। সেখানে যেই আওয়াজ হল, ‘চিচিং ফাঁক’, অমনি খুলে যাচ্ছে সেই গুহার দরজা। তার ভেতরে উৎসাহী কচিকাঁচারা ঢুকে পড়লে সেখানেও দেখতে পাবে ঘড়া ঘড়া রত্নভাণ্ডার! সেসব ছড়িয়ে আছে কতসব পেটিকাতে।

মাঠের চত্বরে শিশির মঞ্চের গায়ে বিরাট বড়ো দেওয়াল জুড়ে দেখতে পাবে, একজন ছোট্ট অভিযাত্রী তার হাতের টর্চ নিয়ে খুঁজে চলেছে লুকানো গুপ্তধন।পাশে টানা বেজে চলেছে আরব বেদুইনদের সুর।থিম যখন গুপ্তধনের সন্ধান, তখন সেই থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সারা চত্বর জুড়ে শুধু শুধু খোঁজ খোঁজ আর খোঁজ। ওদিকে আবার আরও একটা বাড়তি মজার ব্যাপার আছে। খুঁজে দেখো, এই চত্বরের সঙ্গে লাগোয়া গগনেন্দ্র শিল্পপ্রদর্শশালাতে চলছে ‘গুপ্তধনের অভিযানে’ নামে এক দারুণ প্রদর্শনী। দু-তলা জুড়ে সেই প্রদর্শনীর মধ্যে আছে সারা পৃথিবীর সিনেমা আর গল্পের ভেতর সত্যিকারের গুপ্তধনের সন্ধান। সেইখানে গেলে আবার দেখতে পাবে আরেকটা বিরাট বড়ো ট্রেজার চেম্বার। মানে পুরো মাঠ জুড়ে শুধু গুপ্তধনের গল্প! সেটি খুঁজে পেলেই কিন্তু কেল্লা ফতে।হাতে আর মাত্র কয়েকদিন সময়, তোমরা খুঁজতে শুরু করলে?

‘সিনেমাটোগ্রাফার হল পরিচালকের চোখ’

সৌমিক হালদার, চিত্রনির্দেশক বা ডিরেক্টর অব ফোটোগ্রাফি

ডিরেকশন অব ফোটোগ্রাফি, চলতি কথায় সিনেমাটোগ্রাফার। সিনেমাটোগ্রাফি মানে হচ্ছে সহজ কথায় সিনেমা ফোটোগ্রাফি। ফোটোগ্রাফি মানে হচ্ছে স্টিল ছবি। ফোটোকে গ্রাফ করা। সিনেমাটোগ্রাফি মানে হচ্ছে সিনেমার ছবিকে গ্রাফ করা।অনেকগুলো চলমান স্টিল ছবিকে যখন একসঙ্গে জোড়া হয়, তখন তাতে একটা গতি তৈরি হয়, সেটাকেই বলা হয় সিনেমাটোগ্রাফি। মানে একজন পরিচালক যে গল্পটা বলছেন, সেটাকে ক্যামেরার ফ্রেমের মধ্যে ধরে রাখা এবং সেই ছবিগুলোর সাহায্যে গল্পটা বলা;এটাই হচ্ছে সিনেমাটোগ্রাফারের কাজ। এই কাজটা যিনি করেন, তাঁকে প্রথমে বলা হত ক্যামেরাম্যান।তারপর যখন দেখা গেল, কাজটা শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও কাজ করছেন, তখন বলা হত সিনেমাটোগ্রাফার, আর এখন বলা হয় ডিরেক্টর অব ফোটোগ্রাফি।

পরিচালক যখন একটা গল্প থেকে সিনেমা তৈরি করবেন বলে ঠিক করলেন, তখন একজন সিনেমাটোগ্রাফারের কাজ হল পরিচালকের চোখ হয়ে যাওয়া। মানে পরিচালকের চোখ হয়ে ক্যামেরার লেন্সের ভিতর দিয়ে গল্পটাকে দেখা এবং সেটাকে ফুটিয়ে তোলা। পরিচালক কিন্তু টেকনিক্যাল মানুষ নন। তাঁর মাথায় গল্পটা রয়েছে। সিনেমাটোগ্রাফারই কিন্তু সেই গল্পটার ভিশুয়াল স্টোরিটেলিং করেন। মানে গল্পটা কীরকম দেখতে হবে, পর্দায় সেটা তৈরি করেন। এর জন্য পরিচালকের সঙ্গে সিনেমাটোগ্রাফারের একটা খুব ভালো মেলবন্ধন দরকার হয়।কারণ, গল্পটা পরিচালক কীভাবে বলতে চাইছেন, সেটা সিনেমাটোগ্রাফারকে বুঝতে হয়। পরিচালক অনেকভাবে গল্প বলতে চাইতে পারেন। সেটাকে বুঝে নিয়ে রিক্রিয়েট করার, বাস্তবে ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব সিনেমাটোগ্রাফারের।

পরিচালক যখন প্রথমে স্ক্রিপ্ট পড়েন, তখন থেকেই সিনেমাটোগ্রাফার সঙ্গে থাকেন।তারপর কাজের জন্য একটা টিম তৈরি হয়।সিনেমার জন্য যে সকল জায়গা লাগবে, মানে গল্পটা যেখানে যেখানে যাবে, সেটা ঠিক করে নিতে হয়। এবার সিনেমাটোগ্রাফারের কাজ হল, সেই জায়গাগুলো যাতে ভিশুয়ালি ঠিকঠাক হয়, সেটা দেখা। শুটিং দু-ধরনের হয়।একটা হল লোকেশন শুটিং, অন্যটা স্টুডিয়ো শুটিং। লোকেশন শুটিং-এ যে জায়গায় ঘটনাটা ঘটছে, গল্পের যে চাহিদা, সেখানে গিয়ে শুটিং হয়। সেটা বাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট সবই হতে পারে। আউটডোর হতে পারে মানে শহরের বাইরেও হতে পারে। সেক্ষেত্রে কিন্তু গ্রাম, পাহাড়, জঙ্গল, নদী সবই থাকতে পারে।এবার এই ঠিকঠাক লোকেশন খুঁজে বার করার যে কাজ, সেটাকে বলে লোকেশন হান্টিং বা রেইকি।যখন এই রেইকিটা হয়, তখনও কিন্তু সিনেমাটোগ্রাফারকে সঙ্গে থাকতেই হয়। রেইকির পরে ছবিরে স্ক্রিপ্টের সঙ্গে মিলিয়ে শিডিউল করা হয়, মানে শুটিংটা কোথায় কীভাবে হবে, সেটা ঠিক করা হয়। এরপর যখন সব আলোচনা হয়ে যায়, তখন আর-একবার লোকেশন ভিজিট করা হয়। সেটাকে বলে ফাইনাল রেইকি। এক্ষেত্রেও সিনেমাটোগ্রাফারকে সঙ্গে থাকতেই হয়। এই পুরো কাজটা সম্পূর্ণ হলে তখন শুটিং শুরু হয় এবং সিনেমাটোগ্রাফার এবার সেই শুটিং-এর কাজটা করেন।আমাদের দেশে দুটো ফিল্‌ম স্কুল আছে, পুনেতে আর কলকাতায়। পুনেতে ফিল্‌ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট অব ইন্ডিয়া আর কলকাতায় সত্যজিৎ রায় ফিল্‌ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট।দু-জায়গাতেই সিনেমাটোগ্রাফি পড়ানো হয়। এ ছাড়া ওড়িশা, বেঙ্গালুরুতেও ফিল্‌ম স্কুল আছে। সেখানেও পড়ানো হয়। কলকাতা এবং পুনের জন্য সর্বভারতীয় একটা পরীক্ষা হয়, তার মাধ্যমে ভরতি হতে হয়।আগে এই কোর্সে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা দেওয়া হত, কিন্তু এখন এগুলো ডিগ্রি কোর্স হিসাবেই স্বীকৃতি পেয়েছে বা খুব দ্রুতই পেয়ে যাবে। আমার মনে হয়, কেউ যদি সিনেমাটোগ্রাফারের কাজ করতে চায় তাহলে তার এরকম একটা কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে কোর্স করে নেওয়াটা খুবই জরুরি।

‘ছবির গল্প সাজায় এডিটর’

মহম্মদ কালাম, চলচ্চিত্রের সম্পাদক বা এডিটর

পরিচালক তাঁর ভাবনাটাকে বা গল্পটাকে শুট করে নিয়ে আসেন। কিন্তু গল্পে যেভাবে এক দৃশ্যের পর দুই দৃশ্য থাকে বা দুইয়ের পর তিন নম্বর দৃশ্য থাকে, শুটিং তো আর সেভাবে হয় না। ফলে তাদের ঠিক ঠিক করে আগুপিছু করে সাজানোটা সিনেমা সম্পাদনার প্রথম কাজ। সিনেমাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা ছবি যে যে ক্রমে দেখা যায়, সেগুলি পুরোটা সাজান চিত্রসম্পাদক। আসলে একটি সিনেমাতে প্রাণদান করেন এডিটর।

এই সাজানো ছাড়াও, সিনেমার শুটিং যখন করা হয়, তখন অনেকরকম বাধা থাকে। পারিপার্শ্বিক চাপ, পরিস্থিতির চাপ;এসবও থাকে। তার ফলে পরিচালক ঠিক যেমনটি চাইছেন, সব সময় সেটা করে ওঠা যায় না। তাই ছবিটা টেবিলে নিয়ে এসে তাঁর ভাবনাটাকে ঠিকঠাক সাজিয়ে একটা সঠিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।এই কাজটা করেন একজন এডিটর বা সম্পাদক। স্ক্রিপ্ট যখন পড়া হচ্ছে, তখন থেকেই এডিটরকে পরিচালকের সঙ্গে থাকতে হয়।তারপর শুটিং শুরু হলেও এডিটরকে অনেক সময় শুটিং স্পটে থাকতে হয়।কারণ, অনেক সময় এরকম হয় যে, এমন একটা লোকেশন পাওয়া গেছে, যেটা আর পরে পাওয়া যাবে না। একদিনের জন্য পাওয়া গেছে।পরে আবার নিতে হলে অনেক বেশি টাকা খরচ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে অনলাইন এডিট করে নিতে হয়। কারণ, এডিট করার পরে যদি কিছু জরুরি মনে হয় তাহলে যাতে সেটা তখনই শুট করে নেওয়া যায়। এটা হল অনলাইন এডিটিং। জটিল শুটের ক্ষেত্রে এটা আমরা করে থাকি। এবার ধরা যাক, কোথাও ভিএফএক্স কিছু হচ্ছে, তখন সেখানে যে এডিটিংটা করা হয়, তাকে বলে ওয়্যার এডিটিং। তবে এখন তথ্যপ্রযুক্তি অনেক উন্নত হয়েছে। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেসব শুটিং হয়, সেখানে অনলাইন এডিটিং লাগে। আগে একটা ব্যাপার ছিল, যাকে বলা হত ব্যাক প্রোজেকশন। এখন সেটাই এলইডি প্রোজেকশনে শুট হয়। এক্ষেত্রেও শুট করার সময় অনলাইন এডিটিং করে নিতে হয়। কারণ, এটাও খুব খরচসাপেক্ষ। কোথাও কিছু বাদ পড়ে গেলে সেইটুকুর জন্য আবার পুরোটা প্রথম থেকে করতে হবে।আমাদের যেটা খেয়াল রাখতে হয়, সেটা হল, চরিত্রটা ঠিকঠাক গড়ে উঠছে কি না।মূলত তার ইমোশনাল পয়েন্টের দিকে নজর দিতে হয়। আর গল্পের চলন ঠিক আছে কি না, সেটাও দেখতে হয়, আবার তার সঙ্গে সময়ের দিকেও খেয়াল রাখতে হয়। কারণ, সম্পাদকের কাজ হচ্ছে সঠিক সময়ের মধ্যে গল্পের চলন অক্ষুণ্ণ রেখে সেটাকে বলা।

আমার মনে হয়, যারা ভবিষ্যতে সম্পাদক হতে চায়, তাদের ছোটোবেলা থেকেই স্কুলে নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া উচিত।আর যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়া। বারো ক্লাস পাস করার পর সম্পাদকের কাজ শেখার জন্য পড়াশোনা করতে হবে। আমাদের এখানে রূপকলা কেন্দ্র আর সত্যজিৎ রায় ফিল্‌ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট, দুই জায়গাতেই এটা পড়ানো হয়। পুনের ফিল্‌ম ইন্সটিটিউটেও পড়ানো হয়। তবে বিজ্ঞান নিয়ে না পড়লে এই পড়াশোনাটা শিখতে অসুবিধা হয়। আমি বলছি না, পারবে না, তবে অনেকটাই অসুবিধা হবে। তাই এডিটর হতে চাইলে এগারো-বারো ক্লাসে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে তারপর সম্পাদনা শিখতে ভরতি হওয়াই ভালো।

বিশেষ সাক্ষাৎকার

ছোটোদের ছবি বানানোর খুবই ইচ্ছা আছে

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, অভিনেত্রী

কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসবে আমার দুটি ছবি 'দাবাড়ু' আর 'আইকম বাইকম' দেখানো হচ্ছে। এটা আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। দুটি ছবিতেই অভিনয় করে ভীষণ ভালো লেগেছে। 'দাবাড়ু' যেমন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দাবাড়ু সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক। এই ধরনের ছবির ধারাতে এই ছবিটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটা নিদর্শন। কারণ, দাবা নিয়ে আমাদের দেশে এর আগে খুব বেশি ছবি হয়নি। সত্যজিৎ রায় হিন্দিতে 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' তৈরি করেছিলেন। 'দাবাড়ু'তে মায়ের চরিত্রটি আমার আরও আকর্ষণীয় লেগেছে, কারণ উনি নিজেও ছিলেন একজন দাবাড়ু। ছেলের সংগ্রাম এবং সাফল্যের পেছনে মায়ের যে কতখানি অবদান, সেটা এখানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

অন্যদিকে, 'আইকম বাইকম' একটা খুব মিষ্টি ছবি। এখন তো জীবনটা ভীষণ কৃত্রিম এবং মুঠোফোনে বন্দি হয়ে গিয়েছে। রূপকথার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ছোটোরা। এই ছবি সেই রূপকথার জগৎ, রূপকথার পরিদের কথা আর আরও নানা রকমের গল্প তুলে ধরে।

তবে আমরা এখন বাংলায় সে রকম ছোটোদের ছবি দেখতে পাই না। এর একটা বড়ো কারণ, ছোটোদের মতো করে ভাবার মানসিকতা চলে যাচ্ছে। কিন্তু একসময় আমরা খুব ভালো ভালো ছোটোদের ছবি পেয়েছি। সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ ছোটোদের ছবি বানিয়েছেন। আমি যেমন ছোটোবেলায় 'সাউন্ড অব মিউজিক', 'সোনার কেল্লা', 'জয় বাবা ফেলুনাথ', 'বর্ন ফ্রি', 'জস' এই ছবিগুলো দেখেছি।

আমি সত্যিই ভীষণভাবে মনে করি, ছোটোদের জন্য সিনেমা হওয়া উচিত। অ্যানিমেশন ছবি অবশ্যই হচ্ছে, কিন্তু অন্যান্য সিনেমা ঠিকভাবে তো পাওয়া যাচ্ছে না। আমি আগে বানিয়েছি 'দুয়োরানি সুয়োরানি' নামে একটি ছোটোদের সিনেমা। এখন একটা গল্পও ভেবে রেখেছি। সেটা থেকে ছোটোদের একটি নতুন ধরনের ছবি বানানোর ইচ্ছা অবশ্যই আছে।

অনুলিখন দোলা চৌধুরী

কথোপকথন

শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব ছোটোদের ছবি তৈরির প্রেরণা দেয়

চন্দ্রাশিস রায়, চিত্রপরিচালক

কাকাবাবু সিরিজের নতুন ছবি 'বিজয়নগরের হীরে' সবেই মুক্তি পেয়েছে প্রেক্ষাগৃহে। দেখানো হচ্ছে এবারের উৎসবে। কথা হল পরিচালক চন্দ্রাশিস রায়ের সঙ্গে। কথা বললেন জেবা মুন্সি।

প্রশ্ন কাকাবাবুর নতুন ছবিটি তৈরি করার অনুভূতি কেমন?

উত্তর প্রথমত, আমি কাকাবাবু সিরিজের একটা ফিল্ম তৈরি করতে পেরে খুবই খুশি। বাচ্চারা খুবই খুশি হবে এই ছবিটি দেখার পর, কারণ এখানে আছে নানা রকমের অ্যাডভেঞ্চার আর একের পর এক চমক। এটা আমার প্রথম সিনেমা হলে রিলিজ হওয়া ছবি, তাই এই ছবির প্রযোজকদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। আর আমি কৃতজ্ঞ আপনাদের কমিটির সদস্যদের কাছেও, এই ছবিটিকে এই ধরনের বড়ো একটি উৎসবের অংশ হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য।

প্রশ্ন এই ছবিটিকে কেন্দ্র করে আপনার কিছু বিশেষ অভিজ্ঞতা যদি আপনি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন...

উত্তর আমার একটা চমৎকার কথা মনে পড়ে গেল এই আলোচনার মধ্যে, আমি যখন 'বিজয়নগরের হীরে' সিনেমাটা বানালাম, এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ঘটনা মনে পড়ল ছোটোবেলার। রঞ্জনের যে চরিত্রটি আছে, তাকে আগে আমি অন্যভাবে ভাবতাম। আর সত্যিই হাম্পিতে গিয়ে এক অন্য অনুভূতি কাজ করছিল। গল্পটা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। তাই এই পরিণত বয়সে স্ক্রিপ্টটা আরও বড়ো মাত্রার হয়ে উঠেছিল।

প্রশ্ন কাকাবাবু নিয়ে তো ছবি আগেও হয়েছে। কোনওভাবে কি কাকাবাবুর এই ছবিটা আপনি তার থেকে কিছুটা অন্যভাবে দেখাতে চেয়েছেন?

উত্তর না, আমি অন্যভাবে একদম দেখাতে চাইনি। কিছু জিনিস একটু হয়তো আলাদা হয়েছে আগের সিনেমাগুলোর থেকে, কিন্তু তা-ই বলে, সেটা গল্পের জন্য যতটা, ঠিক ততটাই। এমনিতে গল্পের উপস্থাপনার ধরনে সৃজিতদার (সৃজিত মুখোপাধ্যায়) থেকে আলাদা করবার।

প্রশ্ন এখানে ছোটোদের ছবি সেভাবে বানানো হয় না। তার কারণ কী?

উত্তর আসলে বাণিজ্যিকভাবে যাঁরা ছবি তৈরি করেন, তাঁদের আরও এগিয়ে আসতে হবে এই ধরনের একটি ছবি তৈরির কাজে। আমাদের এখানে সরকারি উদ্যোগে এই যে এত বড়ো একটা উৎসব আয়োজিত হচ্ছে, কত ছোটোরা দেখতে আসছে এই উৎসব। এখানে তো প্রশংসিত হচ্ছে, সেলিব্রেট করা হচ্ছে ছোটোদের ছবি। এই উৎসব থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে আরও বেশি ছোটোদের ছবি তৈরি হতে পারে। ফলে আমরা যদি ছোটোদের ছবি বানাতে চাই, তাহলে কিন্তু আমাদের সব বয়সের বাচ্চাদের কথা ভেবে ছবিগুলি বানাতে হবে।

দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রকাশিত।
উৎসব অধিকর্তা **অর্পিতা ঘোষ** (সভাপতি)। প্রকাশক **মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ**, উৎসব আহ্বায়ক ও সচিব, শিশু কিশোর আকাদেমি।
প্রকাশনা তত্ত্বাবধান **শর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়**, প্রকাশনা পরিচালক, শিশু কিশোর আকাদেমি। মুদ্রণ শ্রীমা এন্টারপ্রাইজ, ৩৫, বৈদ্যনাথ দত্ত সরণি, হাওড়া ৭১১১১৩।
যুগ্ম সম্পাদক **শুভেন্দু দাশমুন্সী, দীপান্বিতা রায়**।